ননজেনেরিক কৌশলগত বা কর্পোরেট স্তর কৌশল

Nongeneric Strategy or Corporate Level Strategy

৭

এ ইউনিটে ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশলনিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ননজেনেরিক বা সর্বজনের অজ্ঞাত কৌশলএর মাধ্যমে কোম্পানি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় করবে এবং কোম্পানির সম্পদ বিভিন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কৌশল কোম্পানির সামগ্রিক পারদর্শিতার প্রসার ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে মূল্যসংযোজন করে। এ জন্য এ কৌশলকে সামগ্রিক কৌশলও বলে। এ কৌশলের সব কয়টি ধরনই এ ইউনিটে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : সর্বজন অজ্ঞাত: ধারণা ও প্রকার, সমবায় কৌশল, কৌশলগত জোট কৌশল ও যৌথ কারবার কৌশল

পাঠ - ৭.২ : একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশল, অধিগ্রহণ কৌশল, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল ও প্রবৃদ্ধি কৌশল

পাঠ - ৭.৩ : কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল, লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল ও ফসল তোলা কৌশল

পাঠ - ৭.৪ : আত্মরক্ষামূলক কৌশল, আক্রমণাত্মক কৌশল,গাঁটখোলা কৌশল ও আউটসোর্সিং কৌশল

পাঠ-৭.১ ননজেনেরিক বাসর্বজন অজ্ঞাত: প্রকৃতি ও প্রকার,সমবায় কৌশল, কৌশলগত জোট কৌশল ও যৌথ কারবার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ইনজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- সমবায় কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- সমবায় কৌশল কেন গ্রহণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কৌশলগত জোট কৌশলকী তা বলতে পারবেন
- কৌশলগত জোট কৌশল কেনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- যৌথ কারবার কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- যৌথ কারবার কৌশল গ্রহণ করা হয় কেনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- যৌথ কারবার ব্যর্থ হয় কেনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশলএর মাধ্যমে কোম্পানি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় করবে এবং কোম্পানির সম্পদ বিভিন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির বিভিন্ন ব্যবসায়ের পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, একীভূতকরণ, কেন্দ্রীকরণ বা পুরজ্জীবিতকরণ কৌশল ব্যবহার করে সমগ্র ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করা হয়। এটি কোম্পানি নিজস্ব অবস্থা পর্যালোচনা করে উদ্ভাবন করে প্রয়োগ করে যা প্রতিযোগীদের জানা থাকে না। এ জন্য ননজেনেরিক বা 'সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল' বলে। আবার কোম্পানিব্যাপী এ কৌশলে প্রতিক্রিয়া পড়ার কারণে এটিকে সামগ্রিক কৌশলও বলে। আমাদের আলোচ্য কৌশলগুলো নিচের ছকে দেওয়া হলো:

১. সমবায় কৌশল [Cooerative strategy]
২. কৌশলগত জোট কৌশল [Strategic alliance strategy]
৩. যৌথ কারবার কৌশল [Joint venture strategy]
৪. একীভূতকরণ/মার্জার কৌশল [Merger strategy]
৫. অধিগ্রহণ কৌশল [Acquisition strategy]
৬. স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল [Stable growth strategy]
৭. প্রবৃদ্ধি কৌশল [Growth strategy]
৮. কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল [Concentration strategy]
৯. লম্বিক একত্রিকরণ কৌশল [Vertical integratoin strategy]
১০. ফসল তোলা কৌশল [Harvesting strategy]
১১. আত্মরক্ষামূলক কৌশল [Defensive strategy]
১২. আক্রমণাত্মক কৌশল [Offensive strategy]
১৩. গাঁটখোলা কৌশল [Unbundling strategy]
১৪. আউটসোর্সিং কৌশল [Outsourcing strategy]

এ পাঠে আমরা তিনটি ননজেনেরিককৌশলনিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো সমবায় কৌশল, কৌশলগত জোট কৌশল ও যৌথ কারবার কৌশল।

সমবায় কৌশল
Cooperative strategy

সমবায় কৌশল বলতে কী বোঝায়

সমবায় কৌশল একটিননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। বর্তমান বিশ্বেবাজার জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশাপাশি জাতীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রতিযোগিতাও তীব্র হয়েছে। অনেক সময় একক কোনো কোম্পানির পক্ষে স্বাধীনভাবে নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতা দিয়ে বাজার প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারছে না। অনেক বাজার অবস্থা আবার একা সমাধান করা যায় না, অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা বা যৌথ প্রচেষ্টা লাগে। এজন্য সমবায় কৌশল উদ্ভব হয়েছে ও তা ব্যাপক ভাবে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতীয় ও বৈশ্বিক সুযোগ কাজে লাগাতে হলে প্রতিযোগীদের যৌথ সম্পদ ও সামর্থ্য ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ কারণে বর্তমানে সমবায় কৌশল কোম্পানির ক্ষমতা ও সামর্থ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হচ্ছে। সমবায় কৌশল দুই রকমের হয়ে থাকে ঃ [ক] কৌশলগত জোট কৌশল ও [খ] যৌথ কারবার কৌশল। আমরা পরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমরা বলব কেন সমবায় কৌশল দরকার।

সমবায় কৌশল গ্রহণ করা হয় কেন?
Why is cooperative strategy undertaken?

সমবায় কৌশল কোন কোন অবস্থার কারণেগ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে। রাষ্ট্রের উদার অর্থনৈতিক নীতি ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার কারণে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, সমবায় কৌশল ব্যবহার করে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

২. বিশ্বের অন্যান্য দেশে ও অঞ্চলে বিশাল বাজারের আবির্ভাব হয়েছে। একক চেষ্টায় এ বাজারে প্রবেশ ও প্রতিযোগিতা করা কঠিন। সে জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে সমবায় কৌশল ব্যবহার করেবিশ্ব বাজারে প্রবেশ ও টিকে থাকার চেষ্টা করে সুফল লাভ করছে।

৩. বিভিন্ন জাতীয় বাজারে নিজের উপস্থিতি ও আকর্ষণীয় অবস্থান ধরে রাখার বৈশ্বিক দৌড়ে অংশগ্রহণ করে কোম্পানির ইচ্ছা বাস্তবায়নে সমবায় কৌশলের সম্মিলিত শক্তি ব্যবহার দরকার।

৪. বিশ্বের বর্তমান প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে প্রযুক্তির উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ শক্তি ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা গড়ে তুলে প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে হলে সমবায় কৌশল প্রয়োজন।

৫. পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক গতি ও পরিবর্তন হওয়ায় বিশ্ব বাজারে ব্যবসায়ের সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে, যা ধরার জন্য একক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। তাই, সমবায় কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. বৈশ্বিক বাজারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দ্রুত ধরতে না পারলে প্রতিযোগীরা নিয়ে নিবে এবং কোম্পানির জন্য ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনতে পারে। এজন্য সুযোগগুলো ধরার জন্য কোম্পানিকে সমবায় কৌশল গ্রহণ করতে হচ্ছে।

৭. দেশের জাতীয় বাজারে পারস্পারিক দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য কোম্পানিগুলো সমবায় কৌশল গ্রহণ ফলপ্রসূ সুবিধা লাভ করছে ও করতে পারে।

এবার আমরা আর একটি সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। সে কৌশল হলো কৌশলগত জোট কৌশল।

কৌশলগত জোট কৌশল
Strategic alliance strategy

কৌশলগত জোট কৌশলের ধারণা

কৌশলগত জোট কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল। **হিল, জোন্স ও গ্যালভিন**এর মতে, কৌশলগত জোট হলো দুই বা ততোধিক কোম্পানির মধ্যে নতুন ব্যবসায় উন্নয়নের ব্যয়, ঝুঁকি এবং সুবিধা ভাগ করে নেয়ার একটি চুক্তি। [Strategic alliance is an agreement between two or more companies to share the costs, risks and benefits of developing new business opportunites.]। কৌশলগত জোট কোনো ইক্যুইটি অংশগ্রহণ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এটি কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানও নয়, এটি যৌথ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাওয়ার জন্য একটা সহযোগিতা চুক্তি মাত্র। এটি পরস্পরের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের তথ্য আদান-প্রদান, যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি, বণ্টন নেটওয়ার্ক ভাগাভাগি ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্য করা হয়। যেমন বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর মধ্যে একই এটিএম মেশিন ভাগাভাগি করা হলো একটা কৌশলগত জোট। পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত একটা চুক্তির মাধ্যমে এ এটিএম মেশিন ভাগাভাগি করা হচ্ছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে মাইক্রোসফট ও ইনটেল, অইবিএম ও ডেল কম্পিউটার ও সফটওয়্যার উৎপাদনে কৌশলগত জোট ব্যবহার করছে। জাপানের টয়োটা কোম্পানি ২০০ সরবরাহকারীর এক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ১,৫০,০০০ রকমের যন্ত্রাংশ গ্রহণ করে। একই ভাবে আইবিএম এর ১০০ এবং ওরাকলের ১৫০০০ কৌশলগত জোট সদস্য আছে। সামগ্রিক বিচারে কৌশলগত জোট এখন বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল।

এবার আমরা কৌশলগত জোট গঠন করার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

কৌশলগত জোট কৌশল গ্রহণ করা হয় কেন?

কৌশলগত জোট কৌশল যে অবস্থার কারণে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, সে সকল অবস্থা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. কোম্পানির নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতায় অর্জনযোগ্য নয় এমন সব সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কৌশলগত জোট করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানি মূল্যবান সম্পদ ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। এ কৌশলের মাধ্যমে বৃহৎ লাভজনক সুযোগ সাফল্যের সাথে ব্যবহার ও সম্পাদন করা যায় এবং কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

২. নতুন পণ্য বা প্রযুক্তি উন্নয়নে, কারিগরি ও উৎপাদন দক্ষতায় ঘাটতি পূরণে, সাপ্লাই চেইন দক্ষতা উন্নয়নে কোম্পানি কৌশলগত জোট গঠনের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করে ও দীর্ঘমেয়াদে বাজারে টিকে থাকতে পারে।

৩. কৌশলগত জোট কৌশলের মাধ্যমে দেশে যৌথ প্রচেষ্টা সফল করার জন্য নানামুখী কোম্পানির সামর্থ্য ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের একটা গাঁট তৈরি করা যায় ও সাফল্য সবাই ভাগ করে নিতে পারে।

৪. বিদেশের অপরিচিত বাজার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ তথ্য কৌশলগত জোটের সদস্যদের মাধ্যমে লাভ করা যায় ও বৈদেশিক বাজার দখল করা সহজ হয়।

৫. কৌশলগত জোটের সদস্যদের সহযোগিতায় সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ দেশের বাজারে দ্রুত প্রবেশ করা যায় এবং বৈশ্বিক বাজারে নিজ কোম্পানির ভিত্তি ও উপস্থিতি গড়ে তোলা যায়।

৬. প্রতিযোগীদের চেয়ে দ্রুততার সাথে নতুন প্রযুক্তিতে নিজ কোম্পানির দক্ষতা এবং নতুন বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায়।

৭. কোম্পানির নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে কৌশলগত জোটের সদস্যদের বিশেষজ্ঞতা ও সম্পদ মিলিত হয়ে যৌথ ক্ষমতা হওয়ার কারণে বড় বড় সুযোগ ও বর্ধিত সুযোগের দুয়ার খুলে যায়।

৮. কৌশলগত জোটের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশাল আকারের বাজার প্রসার ও বিজ্ঞাপনের কাজ বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করা যায় ও বাজার প্রবেশযোগ্যতা বাড়ানো যায়।

আসুন জেনে নেই কৌশলগত জোট ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো কী।

কৌশলগত জোট ব্যর্থ হয় কেন?

কৌশলগত জোটকে সফল ও কার্যকর করতে হলে চলমান অঙ্গীকার, পারস্পারিক শিক্ষা এবং অব্যাহত নৈকট্য বজায় রেখে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া দরকার। এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে জোট ব্যর্থ হবে। নিচে কৌশলগত জোট সফল না হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. জোট সদস্যদের এক সঙ্গে কাজ করার অযোগ্যতা ও অনীহা।
২. জোট সদস্যদের একযোগে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে দেরি করা বা ব্যর্থ হওয়া।
৩. কৌশলগত জোটের শর্তাদি এবং অবস্থাসমূহ পর্যলোচনা করে নবায়ন করতে সদস্যদের অনীহা।
৪. জোট সদস্যদের মধ্যে বাজারে পারস্পারিক শত্রুতা।
৫. কৌশলগত জোটে প্রত্যেক সদস্যের আনীত সম্পদ, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতাকে যথাযথ মূল্য দিতে ও অবদান স্বীকার করতে অনীহা।
৬. সহযোগিতামূলক চুক্তি থেকে প্রাপ্ত ফল সকলের সুবিধায় বণ্টন করায় ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে সকলের জন্যই জয়-জয় (win-win) ফল হতে হবে। কিন্তু তা না হলে জোট ভেঙে যাবে।
৭. কৌশলগত জোটের সদস্যদের বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার থাকলে ঐক্য না হয়ে অনৈক্য বেশি হয়। ফলে জোট কাজ করতে পারে না বরং ভেঙে যায়।
৮. অধিকতর আকর্ষণীয় প্রযুক্তিগত উপায় বের হলে জোট ভেঙে সদস্যরা বেরিয়ে যায় ও নতুন পন্থায় যোগদান করে।

এবার আমরা আর একটি সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। সে কৌশল হলো যৌথ কারবার কৌশল।

যৌথ কারবার কৌশল
Joint venture strategy

যৌথ কারবার কৌশল কী?

যৌথ কারবার কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। আমরা জানি সমবায় কৌশলের আর একটি উপায় হলো যৌথ কারবার কৌশল। যখন একের অধিক প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদ একত্রিত করে কোন কারবার বা প্রকল্প গ্রহণ করে তখন তা হয় যৌথ কারবার কৌশল। যৌথ কারবার কৌশলে কতিপয় প্রতিষ্ঠান ইক্যুইটি সরবরাহ করে যৌথ মালিকানায় একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় বাংলাদেশি কোম্পানি ও জাপানি কোম্পানি বা কোরিয়ান কোম্পানি মিলে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত অনেক কোম্পানিকে কাজ করতে দেখা যায়।

এবার আমরা যৌথ কারবার কৌশল গ্রহণ করারকারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

যৌথ কারবার কৌশল গ্রহণ করা হয় কেন?

যৌথ কারবার কৌশল কতকগুলো পরিবেশগত অবস্থার কারণে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সে সকল অবস্থা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. যৌথ কারবার কৌশল একটি নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যয় ও ঝুঁকি অংশীদাররা ভাগাভাগি করতে পারে।
২. এ কৌশল নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অংশীকোম্পানিদের সম্পদ ও দক্ষতা একত্রিকরণের সুযোগ পায়।
৩. নতুন ব্যবসায় গড়ে তোলার কাজটি যখন কোনো একক প্রতিষ্ঠানের জন্য জটিল ও অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হয় না,সে ব্যবসায়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে এ কৌশল সুযোগ করে দেয়।
৪. যৌথ কারবার কৌশল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দেশীয় বাজারে সরকারি বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও প্রবেশ করার একমাত্র সুযোগ। ভিন দেশের স্থানীয় অংশীদার নিয়ে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করলে সেই শুল্ক বাঁধা ও আমদানি কোটার বাঁধা অতিক্রম করে ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

৫. যৌথ কারবার কৌশলের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যৌথ গবেষণা প্রচেষ্টা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি, উৎপাদন সুবিধার যৌথ ব্যবহার, একে অন্যের পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা, যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়।
৬. আন্তর্জাতিক যৌথ কারবার বিশ্ব বাজারে একটি দেশীয় কোম্পানির প্রতিযোগিতার সক্ষমতা প্রদর্শন ও বৃদ্ধি করার একটি সফল সুযোগ হিসেবে কাজ করে।

এবার আমরা যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয় কেন?

যৌথ কারবার কৌশল সফল ও কার্যকর করতে হলে চলমান অঙ্গীকার, আস্থা ও অব্যাহত নৈকট্য বজায় রেখে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া দরকার হয়। এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হবে। নিচে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. যৌথ কারবার কীভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয়।
২. যৌথ কারবারে স্থানীয় সম্পদ, কিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি ইত্যাদি ও বিদেশি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে ও সে কারণে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয়।
৩. বিদেশি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যখন স্থানীয় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করা শুরু করে, তখন পারস্পারিক অবিশ্বাস শুরু হয়। এ কারণে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয়।
৪. যৌথ প্রযুক্তি হস্তগত করা ও সে বিষয়ে দক্ষ হওয়ার পর স্থানীয় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বতন্ত্র্য ব্যবসায় নিজ ব্রান্ড নামে শুরু করতে পারে। তাহলে যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয়।
৫. যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয় যদি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমান ভাবে যৌথ কারবারে অবদান না রাখে।
৬. যৌথ কারবারে ব্যবহৃত বৈদেশিক প্রযুক্তির গোপনীতা স্থানীয় অংশীদার প্রতিষ্ঠান না রাখতে পারলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং যৌথ কারবার কৌশল ব্যর্থ হয়।

সারসংক্ষেপ:

ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল এর মাধ্যমে কোম্পানি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় করবে এবং কোম্পানির সম্পদ বিভিন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে কীভাবে বন্টিত হবে তা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কৌশল ১৪টি। এ পাঠে আরোচিত হয়েছে তিনটি। সেগুলো হলো সমবায় কৌশল, কৌশলগত জোট কৌশল ও যৌথ কারবার কৌশল। সমবায় কৌশল হলো অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা বা যৌথ প্রচেষ্টা। একক প্রচেষ্টায় টিকে থাকা সম্ভব না হলে সমবায় কৌশল ব্যবহার করা হয়। কৌশলগত জোট হলো দুই বা ততোধিক কোম্পানির মধ্যে নতুন ব্যবসায় উন্নয়নের ব্যয়, ঝুঁকি এবং সুবিধা ভাগ করে নেয়ার একটি চুক্তি। কোম্পানির নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতায় অর্জনযোগ্য নয় এমন সব সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কৌশলগত জোট করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানি মূল্যবান সম্পদ ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। যখন একের অধিক প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদ একত্রিত করে কোনো কারবার বা প্রকল্প গ্রহণ করে তখন তা হয় যৌথ কারবার কৌশল। যৌথ কারবার কৌশলে কতিপয় প্রতিষ্ঠান ইকুইটি সরবরাহ করে যৌথ মালিকানায় একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

পাঠ-৭.২ একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশল, অধিগ্রহণ কৌশল, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল ও প্রবৃদ্ধি কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- একীভূতকরণকৌশলকী তা বলতে পারবেন।
- অধিগ্রহণ কৌশলকী তা বলতে পারবেন।
- অধিগ্রহণ কৌশল ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে তাব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে নাতাব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল কী তা বলত পারবেন।
- স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল কেনগ্রহণ করা হয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রবৃদ্ধি কৌশল কী তা বলতে পারবেন।
- প্রবৃদ্ধি কৌশল কৌশল গ্রহণ করা হয় কেনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এই পাঠে আমরা তিনটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশল, অধিগ্রহণ কৌশল, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল ও প্রবৃদ্ধি কৌশল।প্রথমে একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করা হবে।

একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশল
Merger strategy

একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশলের ধারণা

একীভূতকরণ কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশলে দুই বা ততোধিক কোম্পানি একত্রিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে নতুন নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে আত্মপ্রকাশ করে এবং পুরাতন বিলুপ্ত কোম্পানিদের কার্যক্রম নতুন কোম্পানির কার্যক্রম হিসেবে পরিচালনা করে। নতুন কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়। একীভূতকরণ কৌশলে বিলুপ্ত কোম্পানিদের সম্পদ ও সক্ষমতা একত্রিত হয়ে নতুন কোম্পানিতে বিনিয়োজিত হয়। এ একীভূতকরণ দেশের দুইটি বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হতে পারে। আবার দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একীভূত হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড (BDBL) নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক একীভূতকরণের একটি উদাহরণ হলো যুক্তরাজ্যের রেকিট এন্ড কোলম্যান ও নেদারল্যান্ডের বেংকিসার একীভূত হয়ে রেকিট বেংকিসার (Reckitt Benckiser) নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। একীভূতকরণ হয়ে গঠিত নতুন কোম্পানির বাজার প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনেক বেশি হয় ও বাজারে সাফল্যের সঙ্গে টিকে থাকা সম্ভব হয়।

এবার আমরা একীভূতকরণ কৌশলের সুফল নিয়ে আলোচনা করব।

একীভূতকরণ কৌশলের সুফল

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এককভাবে দীর্ঘদিন সাফল্য ধরে রাখা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমন্বিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। এ প্রচেষ্ঠারই একটি উপায় হলো একীভূতকরণ কৌশল। আমরা এখন এ কৌশলের প্রত্যাশিত সুফলগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১. কোম্পানির বাজার অবস্থার নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটে। একীভূত কোম্পানিগুলোর সমন্বিত সুনাম ও বাজার অবস্থান একত্রিত হওয়ার কারণে এ বিরাট পরিবর্তন আসে।

২. একীভূতকরণ কৌশলের ফলে সম্পদ ও সামর্থ্যে সক্ষমতা বাড়ার কারণে কোম্পানির সামনে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার বিশাল নতুন সুযোগের দরজা খুলে যায়।

৩. একীভূতকরণ কৌশলের ফলে সম্পদের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। একীভূতকরণের পূর্বে একীভূত কোম্পানিগুলো আলাদা ভাবে সম্পদের যে ঘাটতি ছিল তা এখন থাকে না।

৪. একীভূতকরণ কৌশলের মাধ্যমে গঠিত নতুন কোম্পানি বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকায় কাজ করতে পারে এবং অধিকতর আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নতুন সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

৫. একীভূতকরণ কৌশল অনেক ব্যয় কমিয়ে দেয়। একীভূতকরণের পূর্বে কোম্পানিগুলোর আলাদা আলাদা ভাবে যে ব্যয় করতে হতো তা এখন বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, দুইটি কোম্পানি একীভূত হলে একজন প্রধান নির্বাহী কমে যায়। একই ভাবে অন্যান্য অনেক দ্বৈতব্যয় কমে যায়।

এবার আমরা আর একটি সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব। সে কৌশলটি হলো অধিগ্রহণ কৌশল।

অধিগ্রহণ কৌশল
Acquisition strategy

অধিগ্রহণ কৌশল কী?

অধিগ্রহণ কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল।অধিগ্রহণ কৌশল হলো একটি কোম্পানি কিনে নেয়ার কৌশল। যখন এক কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানিকে কিনে নেয় বা ১০০ ভাগ শেয়ার কিনে নেয় তখন অধিগ্রহণকরা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এখানে অধিগ্রহণকৃত কোম্পানি তার স্বাধীন স্বত্তা হারাবে এবং ক্রয়কারী কোম্পানির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। যেমন বাংলাদেশে স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক গ্রিনলেজ ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এলাকায় অবস্থিত ব্রাঞ্চ কিনে নিয়ে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

এবার আমরা কী কারণে অধিগ্রহণ করা হয় তা নিয়ে কথা বলব।

অধিগ্রহণ কৌশল ব্যবহারের কারণ

কতকগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে অধিগ্রহণ কৌশল গ্রহণ করা হয়। সে সকল কারণে অধিগ্রহণ কৌশল গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **বাজার শক্তি বাড়ানো:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে অধিগ্রহণকারী কোম্পানির সামগ্রিক সম্পদ ও দক্ষতা বাড়ে। ফলে, বাজারে তার আধিপত্য বাড়ে।প্রতিযোগিতা করার শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ে।

২. **প্রবেশ বাঁধা অতিক্রম করা:** বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দেশীয় বাজারে প্রবেশে সরকারি বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে সে বাঁধা সহজে অতিক্রম করা যায় এবং নতুন আঙ্গিকে ব্যবসায় করা যায়।

৩. **নতুন পণ্য উন্নয়নের ব্যয় কমানো:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে অধিগ্রহণকারী কোম্পানির পণ্য উন্নয়ন ও গবেষণার সামর্থ্য বাড়ার কারণে অধিকতর দক্ষ জনশক্তি এ ক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে পারে। ফলে নতুন পণ্য উন্নয়নের ব্যয় কমানো সম্ভব হয়।

৪. **বাজারে দ্রুত প্রবেশ করা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত বাজারে প্রবেশ করা যায়। নতুন কোম্পানি গঠন করে বাজারে প্রবেশের যে দীর্ঘ সময়, জটিলতা ও বাঁধা থাকে, তা অধিগ্রহণ কৌশলের ক্ষেত্রে থাকে না।

৫. **ব্যবসায়ের বৈচিত্র্যকরণ বৃদ্ধি করা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে যৌথ সক্ষমতা অর্জিত হয়। ফলে, নতুন শিল্পে ব্যবসায় গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেয়া সহজ হয়। এ ভাবে ব্যবসায়ের বৈচিত্র্যকরণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

৬. **উন্নত সক্ষমতার ব্যবহার করা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে যৌথ সক্ষমতার সম্মিলিত শক্তি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ক্ষমতা সব দিক দিয়ে বাড়ে। ফলে,অধিগ্রহণকারী কোম্পানিউন্নত সক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

৭. **বিদ্যমান বিক্রয় শক্তির উন্নততর ব্যবহার করা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে বিস্তৃত বাজার লাভ করা যায়। অধিগ্রহণকারী কোম্পানির বিদ্যমান বিক্রয় শক্তির উন্নততর ব্যবহার করা যায়। তারা অলস বসে থাকতে পারে না।

৮. **উৎপাদনে মিতব্যয় অর্জন করা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত,উৎপাদনী ও মানব সম্পদ দক্ষতা বাড়ার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অপচয় কম হয় এবং উৎপাদনে মিতব্যয় অর্জন করা যায়।

৯. **অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলা:** অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা হয় বলে কোম্পানির প্রতিযোগী কমে যায় ও অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলা যায়।

এবার আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ কৌশল ভালোভাবে কাজ করে তা নিয়ে কথা বলব।

কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে?

অধিগ্রহণ কৌশল কতকগুলো পরিবেশগত অবস্থার কারণে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সে অবস্থাগুলো এবার বলব।

১. যখন অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির যে সক্ষমতা আছে তা অধিগ্রহণকারী কোম্পানির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়।
২. বাজারে দ্রুত নিজের উপস্থিতি জাহির করা ও নগদ প্রবাহ বাড়ানো দরকার হয়।
৩. প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি অধিগ্রহণ করে নিজ কোম্পানির ঝুঁকি কমানোর দরকার হয়।
৪. কোন বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের বাঁধা অতিক্রম করার দরকার হয়।

এবার বলব কোন কোন ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে না।

কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে না?

যে অবস্থাসমূহ অধিগ্রহণ কৌশলের জন্য অনুকূল না সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির বিপরীতমুখী সংস্কৃতি অঙ্গীভূত করা সম্ভব না হলে অধিগ্রহণ কৌশলের সুবিধা পাওয়া যাবে না বরং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।
২. অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধার অতিরঞ্জিত প্রাক্কলন করা হয়ে থাকলে।
৩. অতিরিক্ত ব্যয়ে অধিগ্রহণ করলে তা অধিগ্রহণকারী কোম্পানির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, অধিগ্রহণ কৌশলের সুফল পাওয়া যায় না।
৪. অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির সম্পদ ও দায় যথাযথ যাচাইবাছাই না করে অধিগ্রহণ করলে অধিগ্রহণ কৌশল ব্যর্থ হয়।

এবার আমরা যে সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল।

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল
Stable growth strategy

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল কাকে বলে?

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশলহচ্ছে একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। কোনো সংগঠন তার অতীত কার্যপারদর্শিতা নিয়ে খুশি থাকলে পরবর্তীতে একই রকম কার্যপারদর্শিতা অর্জন করতে চায় এবং সেই কার্যপারদর্শিতার স্তরকে ভবিষ্যতের জন্য কৌশলগত লক্ষ্য স্থির করে। কার্যপারদর্শিতার অগ্রগতি একই মাত্রার বলে এ কৌশলের নাম স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল।

এ কৌশলে প্রতি কালান্তিক অর্জনমাত্রা একই বা প্রায় একই রকম আশা করা হয়। ক্রেতাদেরকেও একই রকম পণ্য বা সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হয়। এটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন কৌশল। যে শিল্প পরিবেশে উত্থানপতন হয় না এবং যে শিল্পে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি আছে, সে ধরনের শিল্পে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশলগ্রহণ করা হয়।

এবার আমরা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশলগ্রহণ করার পেছনে কারণ কী কী তা নিয়ে কথা বলব।

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণের কারণসমূহ

কতকগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হয়। সে সকল কারণে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. কোম্পানি ব্যবস্থাপকগণ বিদ্যমান কৌশল পরিবর্তন করে নতুন কৌশল গ্রহণের ঝুঁকি নিতে চায় না। সে ক্ষেত্রে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল নেয়।

২. কৌশল পরিবর্তন করলে সম্পদের বণ্টন পরিবর্তন করতে হয়। ফলে নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩. দ্রুত প্রবৃদ্ধি সামাল দিতে সাংগঠনিক কার্যক্রমে ব্যাপক গতি সঞ্চার করতে হয়, যার সাথে তাল মিলানোর মতো প্রশাসনিক সম্পদ থাকে না। সুতরাং স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল ভালো।

৪. বাজার চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সমগতিতে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা অনেক সময় সীমিত সম্পদ বা সক্ষমতার অভাবের কারণে অপরাগ হয়। সে ক্ষেত্রে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশলের বিকল্প থাকে না।

৫. ব্যবস্থাপকগণ 'আগে কাজ পরে চিন্তা' নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে, তারা চলতি কৌশলের পুনরাবৃত্তি করে যায় এবং পরে পরিস্থিতির ঝড়তিপড়তি নিয়ে চিন্তা করে। সে কারণে তারা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করে।

৬. স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল সহজ ও আরামদায়ক। কেননা, যে কোনো নতুন কৌশল গ্রহণ একটা লম্বা ও ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা লাগে। এ ঝামেলা এড়াতে কৌশলবিদগণ স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করে।

৭. শিল্প পরিবেশে পরিবর্তন কম, হুমকি কম ও সুযোগও কম। এ সব অবস্থায় স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা ভালো।

এবার আমরা যে সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো প্রবৃদ্ধি কৌশল।

প্রবৃদ্ধি কৌশল
Growth strategy

প্রবৃদ্ধি কৌশল বলতে কী বোঝায়

প্রবৃদ্ধি কৌশল হচ্ছে একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল। প্রবৃদ্ধি কৌশল হলো বাজারের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার কৌশল। এ কৌশল শিল্পের গড় মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্য স্থির করে। মোট কথা, ক্রমবর্ধমান হারে বাজার বৃদ্ধি ও মুনাফা বৃদ্ধি করার কৌশল হলো প্রবৃদ্ধি কৌশল। যে সকল কোম্পানি নতুন পণ্য উৎপাদনে সক্ষম, পণ্য উদ্ভাবনে সক্ষম, নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সক্ষম এবং নতুন বাজার তৈরি করতে সক্ষম, তারা প্রবৃদ্ধি কৌশল ব্যবহার করতে পারে। প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণকারী এ সকল কোম্পানি পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে ও নতুন চাহিদা তৈরি করতে পারে। এ কারণে এ সকল কোম্পানি অস্থিতিশীল বাজারেও কাজ করতে পারে।

এবার আমরা প্রবৃদ্ধি কৌশলগ্রহণ করার পেছনে কারণ কী তা নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রবৃদ্ধি কৌশল কেন গ্রহণ করা হয়?

কতকগুলো তাড়না শক্তি কোম্পানিকে প্রবৃদ্ধি কৌশলগ্রহণ করার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করে। যে সকল কারণে প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির জন্য প্রবৃদ্ধি কৌশল সবচেয়ে দ্রুততম উপায় বলে মনে করা হয়।

২. বর্ধিত মুনাফা ও বাজারের জন্য কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী শেয়ারমালিকগণ, ঋণপত্রধারীগণ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক স্বার্থযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রবল চাপ থাকে। কেননা, এ সকল পক্ষগণ তাদের প্রাপ্য পেতে কোন ঝুঁকিতে থাকতে চায় না।

৩. পরিবর্তনশীল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন একটি রক্ষাকবচ। কেননা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে গেলে প্রতিষ্ঠানের আকার ও উৎপাদন বাড়ানো দরকার।

৪. প্রবৃদ্ধিকে অনেক ব্যবস্থাপক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা হিসেবে গণ্য করে। প্রবৃদ্ধি আছে, প্রতিষ্ঠান ভালো; প্রবৃদ্ধি নাই, প্রতিষ্ঠান খারাপ।

৫. প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। কর্মসংস্থান বাড়ে, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি বাড়ে, সরকার কর বেশি পায়, মানুষের ভোগ বাড়ে ও তারা কম দামে পণ্য পায় এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন যাত্রার মান বাড়ে।

৬. ব্যবস্থাপকরা অধিক হারে উৎসাহ ভাতা পায়। বিক্রয় ও মুনাফা বাড়ার কারণে তারা আর্থিক ও অন্যান্য পুরস্কার পায়।

৭. প্রতিষ্ঠানের আকার ও অভিজ্ঞতা বাড়ার কারণে ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পারদর্শিতা ও মান বাড়ে।

৮. প্রবৃদ্ধি কৌশল ব্যবহার করলে বাজারে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

একীভূতকরণ কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। একীভূতকরণ বা মার্জার কৌশলে দুই বা ততোধিক কোম্পানি একত্রিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে নতুন নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আত্মপ্রকাশ করে এবং পুরাতন বিলুপ্ত কোম্পানিদের কার্যক্রম নতুন কোম্পানির কার্যক্রম হিসেবে পরিচালনা করে। এ কৌশলে কোম্পানির বাজার অবস্থার নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটে। অধিগ্রহণ কৌশল হলো একটি কোম্পানি কিনে নেয়ার কৌশল। যখন এক কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানিকে কিনে নেয় বা ১০০ ভাগ শেয়ার কিনে নেয় তখন অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। অধিগ্রহণ কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানির বাজারে আধিপত্য বাড়ে ও প্রতিযোগিতা করার শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ে। স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশলে প্রতি কালান্তিক অর্জনমাত্রা একই বা প্রায় একই রকম আশা করা হয়। ক্রেতাদেরকেও একই রকম পণ্য বা সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হয়। এটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন কৌশল। প্রবৃদ্ধি কৌশল হলো বাজারের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার কৌশল। এ কৌশলে কোম্পানি পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারে ও নতুন চাহিদা তৈরি করতে পারে।

পাঠ-৭.৩ কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল, লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল ও ফসল তোলা কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কেন্দ্রীভূতকরণকৌশলকী তা বলতে পারবেন।
- কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলে গৃহীত কার্যক্রম বলতে পারবেন।
- কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল কী তা বলতে পারবেন।
- কোন কোন অবস্থায় লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল গ্রহণ করা হয় তাব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের অসুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফসল তোলা কৌশল বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- কী অবস্থা হলে ফসল তোলা কৌশল ব্যবহৃত হবে তা বলতে পারবেন।
- ফসল তোলা কৌশলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা বলতে পারবেন।
- ফসল তোলা কৌশলের খারাপ প্রতিক্রিয়া কী কী তা বলতে পারবেন।

এ পাঠেও আমরা ননজেনেরিককৌশল নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখবো। তবে, এ পাঠে আমরা অন্যান্য আরও তিনটি ননজেনেরিক বা সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল, লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল ও ফসল তোলা কৌশল।প্রথমে কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল
Concentration strategy

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল কী?

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল হলো কোনো একটি পণ্য বা সেবা অথবা নিকট সাদৃশ্য আছে এমন কয়েকটি পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে গৃহীত বাজার কৌশল। এর মাধ্যমে বিক্রয়, মুনাফা বা বাজার শেয়ার বাড়ানো যায়। বাজার চাহিদা পূরণে ঘাটতি, প্রতিযোগীদের কম বিক্রয়, অপর্যাপ্ত বণ্টন, পণ্য লাইনে ঘাটতি ইত্যাদি অবস্থা মোকাবেলায় কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল নেওয়া হয়।

এবার আমরা জানব কী কী কার্যক্রম এ কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলে নেওয়া হয়।

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলে গৃহীত কার্যক্রম

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল বাস্তবায়ন করার জন্য যে কার্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. চালু পণ্যের লাইনে ঘাটতি পূরণে নতুন আকারে, স্টাইলে ও বর্ণে পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাত করা।

২. জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন ভৌগলিক এলাকায় বণ্টন প্রণালি বাড়ানো।

৩. কোনো একটি ভৌগলিক এলাকায় নতুন বিক্রয় কেন্দ্র বাড়ানো।

৪. বর্তমান খুচরা দোকানে নিজ পণ্যের প্রদর্শনী বাড়ানো এবং বণ্টন কেন্দ্রের স্থান ও বণ্টন কেন্দ্রের শোভা বৃদ্ধি করা।

৫. প্রসার ও পণ্যমূল্য কৌশলের মিশ্রণ ঘটিয়ে যারা পণ্য ব্যবহার করে না তাদেরকে পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও যারা কম ব্যবহার করে তাদেরকে আরও বেশি ব্যবহার করায় প্ররোচিত করা।

৬. প্রতিযোগীর বাজারে নানা রকমের বাজার প্রসার কৌশলের মিশ্রণ ঘটিয়ে অনুপ্রবেশ করা।

এবার কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের তিনটি ধরন আছে। সেগুলো হলো-

১. **বাজার উন্নয়ন কৌশল:** বাজার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এ কৌশলের লক্ষ্য। বর্তমান বাজারের বড় অংশ দখল করা, নতুন ভৌগলিক এলাকায় বাজার সৃষ্টি করা ও নতুন বাজার অংশকে আকর্ষণ করে বাজার বর্ধিত করার মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন করা হয়।

২. **পণ্য উন্নয়ন কৌশল:** কোম্পানি তার পণ্য বা সেবার মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে বা নিকটতম কোনো পণ্য বা সেবা সংযুক্ত করে পণ্য উন্নয়ন করতে পারে এবং এ উন্নত পণ্য কেম্পানির বিদ্যমান বণ্টন প্রণালির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। ফলশ্রুতিতে, কোম্পানির প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত হয়।

৩. **সমান্তরাল একীভূতকরণ কৌশল:** সমজাতীয় পণ্য বা সেবা প্রদানকারী একটি বা দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যারা বণ্টন প্রণালির একই স্তরে আছে, যখন মূল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধি আনার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে সমান্তরাল একীভূতকরণ কৌশল। এটি অন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে অথবা দুটি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণ করে করা যায়।

এবার আমরা যে সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল।

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল
Vertical integration strategy

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল কী?

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলএকটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। আবার লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলএকটি প্রবৃদ্ধি কৌশলও বটে।এ প্রবৃদ্ধি কৌশল সামনে ও পেছনে দুই দিকে প্রসারণের মাধ্যমে সংগঠনের বর্তমান ব্যবসায় বাড়াতে চায়। অর্থাৎ কোম্পানির সামনে ও পেছনে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রসার করা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রচেষ্টার নাম হলো লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল। সামনে পিছনের এ প্রসারণ কাজকে বলে অগ্রমুখী একত্রীকরণ ও পশ্চৎমুখী একত্রীকরণ।

অগ্রমুখী একত্রীকরণ বলতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার বণ্টন নিজস্ব মালিকানাধীন সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদন করা। যেমন বাটা কোম্পানি তার নিজস্ব শোরুমের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশব্যাপী জুতা বিক্রয় করে। এ রকম ভাবে নিজের উপাদিত পণ্য নিজস্ব দোকানের মাধ্যমে বণ্টন করাকে অগ্রমুখী একত্রীকরণ বলে।

পশ্চৎমুখী একত্রিকরণ হলো নিজের উৎপাদন বা সেবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য যে কাঁচামাল ও অন্যান্য সরবরাহ লাগে তা নিজের স্থাপিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা। অর্থাৎ নিজের ব্যবহার্য কাঁচামাল বা ইনপুটসমূহ নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যমে পাওয়ার কৌশল হলো পশ্চৎমুখী একত্রিকরণ। লম্বিক একত্রীকরণের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়। পরের পাতায় প্রদর্শিত চিত্রে লম্বিক একত্রীকরণকে দেখানো হলো।

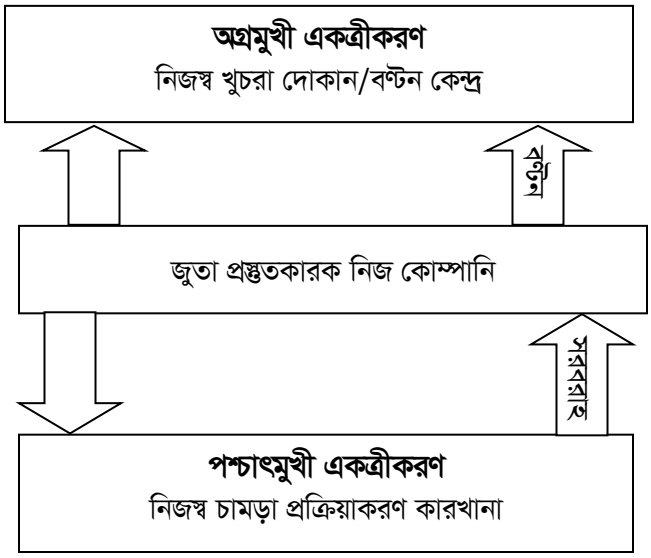

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল

চলুন জেনে নেই কেন এ লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল গ্রহণ করা হয়।

কোন কোন অবস্থায় লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল গ্রহণ করা হয়

কতকগুলো চালক অবস্থা কোম্পানিকে প্রবৃদ্ধি কৌশলগ্রহণ করার পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করে। যে সকল কারণে প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো -

১. যখন চূড়ান্ত ভোক্তাদের চাহিদা বর্তমান সরবরাহকারীরা পূরণ করতে পারে না।
২. যখন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা খুবই পরিবর্তনশীল হয়।
৩. যখন লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানির কাঠামোগত অবস্থান বৃদ্ধি পায়।
৪. যখন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান না কিনে লম্বিক একত্রীকরণ করা সম্ভব হয়।

এবার লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের সুবিধাবলি আলোচনা করা হবে।

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের সুবিধাবলি

সুবিধা না পেলে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই কোনো কাজ করে না। এ কারণে লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের সুবিধাবলি কী কী তা জানার চেষ্টা করব।

১. পশ্চাৎমুখী একত্রীকরণ কৌশল কাঁচামালের সরবরাহ, মান ও ব্যয়ের ওপর ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। কেননা, ব্যয় কেন্দ্র ও মুনাফা কেন্দ্র উভয়ের ওপরই প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকে।
২. অগ্রমুখী একত্রীকরণ কৌশল বিক্রয় ও বণ্টনের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ফলে, বৃহৎ মজুত করা লাগে না এবং উৎপাদনে ধীর গতি থাকে না।
৩. অগ্রমুখী একত্রীকরণ কৌশলেরমাধ্যমেবণ্টন প্রণালির অর্জিত মুনাফা প্রতিষ্ঠান পায় এবং দক্ষ ও কার্যকর বণ্টন প্রণালি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।
৪. লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল উৎপাদনে মিতব্যয়িতা অর্জন করে। সে কারণে সার্বিক ব্যয় কমে যায় ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়।
৫. লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল কোম্পানির আকার ও ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে, বাজারে এক ধরনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে।

এবারলম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের অসুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের অসুবিধাবলি

লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যা আছে। সেগুলো হলো -

১। লম্বিক একত্রিকরণ কৌশল মূল্য চেইনের কিছু কাজে আর্থিক সম্পদ বিনিয়োজিত করে। ফলে, অন্য লাভজনক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় না।

২। এ কৌশল একবার কার্যকর করলে কম দামে আউটসোর্সিং করার সুযোগ আসলে তা গ্রহণ করা যায় না। ফলে কোম্পানি তার প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হারাতে পারে।

৩। লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল অভ্যন্তরীণ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পরিবর্তনশীল ক্রেতা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে। কেননা, প্রয়োজনীয় নমনীয়তা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

৪। লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল বাস্তবায়নে পশ্চাৎমুখী একত্রীকরণ ও অগ্রমুখী একত্রীকরণের জন্য বহুমুখী দক্ষতা ও যোগ্যতা দরকার হয়। এগুলো পূরণ করা ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণে এ কৌশল লাভজনক নাও হতে পারে।

এবার আমরা যে সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো ফসল তোলা কৌশল।

ফসল তোলা কৌশল
Harvesting strategy

ফসল তোলা কৌশল কাকে বলে?

ফসল তোলা কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কৃত বিনিয়োগ ফেরত আনার একটি কৌশল। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্খা থেকে বিনিয়োগকে রক্ষা করার জন্য এ ফসল তোলা কৌশল। **মিলার ও ডেস** (১৯৯৬) বলেন, 'ফসল তোলা কৌশল হলো সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত উপায়ে একটি ব্যবসায়কে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া' [A harvesting strategy is a process of gradually letting a business wither in a carefully controlled and calculated fashion]। ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার করে কোম্পানি ধীরে ধীরে একটি ব্যবসায় থেকে অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হওয়ার আগে যতদূর সম্ভব বিনিয়োগ তুলে আনে। এটি হলো ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ফেলা বা শেষ খেলার পদ্ধতি। ধীরে ধীরে নানা উপায়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ অর্থ তোলে নিয়ে তা এক সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ কৌশল অনেকগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে এমন কোম্পানি অর্থাৎ বৈচিত্র্যকৃত কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য।

এবার আলোচনা করা হবে কোন অবস্থার কারণে এ ফসল তোলা কৌশল গ্রহণ করা হয়।

কী অবস্থা হলে ফসল তোলা কৌশল ব্যবহৃত হবে

ফসল তোলা কৌশল কখন ব্যবহার করতে হবে তার একটি বর্ণনা ফিলিপ কটলার (১৯৭৮) তার একটি গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত নিম্ন বর্ণিত যে কোনো একটি অবস্থা বা কয়েকটি অবস্থা বা সব কয়টি অবস্থা বিরাজ করলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি থেকে বিনিয়োগ তোলে আনতে হবে। এবার নিচের বর্ণনা থেকে অবস্থাগুলো জেনে নিন।

১. **বাজার পড়ে যাচ্ছে।** কোম্পানির পণ্যের বাজার এখন পতনশীল পর্যায়ে আছে।
২. **সামান্য বাজার শেয়ার ও ব্যয়সাপেক্ষ বৃদ্ধি প্রচেষ্টা।**কোম্পানির বাজার শেয়ার খুবই কম ও এ শেয়ার বাড়াতে হলে ব্যাপক বিনিয়োগ দরকার।
৩. **ব্যয়সাপেক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ।** কোম্পানির বর্তমান বাজার শেয়ার ধরে রাখার ব্যয় বিশাল।
৪. **মুনাফা বাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম বা আকর্ষণহীন।**কোম্পানির বর্তমান মুনাফা বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া, কোম্পানিটি বাজারে তার আকর্ষণ হারিয়েছে।
৫. **সম্পদ সহায়তা কমালে বিক্রয় কমবে না।** কোম্পানি থেকে ক্রমান্বয়ে সম্পদ সহায়তা কমিয়ে আনলে বিক্রয় তেমন বড় আকারে কমবে না।

৬. **লাভজনক পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ।**কোম্পানি থেকে প্রত্যাহারকৃত অর্থ পুনঃবিনিয়োগের লাভজনক ক্ষেত্র অর্থনীতিতে আছে।
৭. **গুরুত্বহীন পোর্টফোলিও সদস্য।** প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পোর্টফোলিওর জন্য কোম্পানিটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।
৮. **সার্বিক অর্জনেঅবদান কম।**সার্বিক ব্যবসায়িক পোর্টফোলিওর লাভজনকতায়, সুনামে ও বিক্রিতে এ কোম্পানির তেমন কোনো উল্লেখ্যযোগ্য অবদান নেই।

এবার আমরা আলোচনা করবফসল তোলা কৌশলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় সে সম্পর্কে।

ফসল তোলা কৌশলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়

ফসল তোলা কৌশল বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার একটি কৌশল। এ জন্য ব্যবস্থাপকগণ নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে থাকেন। সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. কোম্পানিতে পুনঃবিনিয়োগ কমিয়ে আনা হয়।
২. কোম্পানি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তন করা হয়।
৩. কোম্পানির বাজারজাতকরণ কার্যক্রম কমিয়ে আনা হয়।
৪. সকল গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ বন্ধ করা হয়।
৫. কোম্পানিতে ব্যবস্থাপকীয় লোকজন কমিয়ে ফেলা হয়।

এবার আমরা ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার করলে কী কী খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় তা নিয়ে আলোচনা করব।

ফসল তোলা কৌশলের খারাপ প্রতিক্রিয়া

ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার করলে প্রতিষ্ঠানের দায়গ্রহণকারীদের ওপর নানা ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়ে। সে সকল খারাপ প্রতিক্রিয়া নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার শুরু করলে কর্মচারীদের মধ্যে চাকরি হারানো ভীতি তৈরি হয় ও তাদের মনোবল কমে যায়।
২. কোম্পানির কাছ থেকে বিক্রয়োত্তর সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতারা ভয় পেয়ে যায়।
৩. সরবরাহকারীরা সতর্ক হয়ে যায় ও বাকিতে পণ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার করতে হয়।

সারসংক্ষেপঃ

কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল হলো কোন একটি পণ্য বা সেবা অথবা নিকট সাদৃশ্য আছে এমন কয়েকটি পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে গৃহীত বাজার কৌশল। এর মাধ্যমে বিক্রয়, মুনাফা বা বাজার শেয়ার বাড়ানো যায়। বাজার চাহিদা পূরণে ঘাটতি, প্রতিযোগীদের কম বিক্রয়, অপর্যাপ্ত বণ্টন, পণ্য লাইনে ঘাটতি ইত্যাদি অবস্থা মোকাবেলায় কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশল নেয়া হয়। কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের তিনটি ধরন আছে। বাজার উন্নয়ন কৌশল,পণ্য উন্নয়ন কৌশল ও সমান্বরাল একীভুতকরণ কৌশল। লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল একটি প্রবৃদ্ধি কৌশলও বটে। এ প্রবৃদ্ধি কৌশল সামনে ও পেছনে দুই দিকে প্রসারণের মাধ্যমে সংগঠনের বর্তমান ব্যবসায় বাড়াতে চায়। ফসল তোলা কৌশল একটি ননজিনেরিক বা সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কৃত বিনিয়োগ ফেরত আনার একটি কৌশল। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্খা থেকে বিনিয়োগকে রক্ষা করার জন্য এ ফসল তোলা কৌশল। ফসল তোলা কৌশল ব্যবহার করে কোম্পানি ধীরেধীরে একটি ব্যবসায় থেকে অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হওয়ার আগে যতদূর সম্ভব বিনিয়োগ তোলে আনে। এটি হলো ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ফেলা বা শেষ খেলার পদ্ধতি। ধীরে ধীরে নানা উপায়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ অর্থ তুলে নিয়ে তা এক সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ কৌশল অনেকগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে এমন কোম্পানি অর্থাৎ বৈচিত্র্যকৃত কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য।

পাঠ-৭.৪ আত্মরক্ষামূলক কৌশল, আক্রমণাত্মক কৌশল,গাঁটখোলা কৌশল ও আউটসোর্সিং কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আত্মরক্ষামূলক কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- কখন আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিতে হবেতা বলতে পারবেন
- আত্মরক্ষামূলক কৌশল কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- আক্রমণাত্মক কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- সফল আক্রমণাত্মক কৌশলের পূর্বশর্ত বর্ণনা করতে পারবেন
- আক্রমণাত্মক কৌশলের ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- গাঁটখোলা কৌশল কী তা বলতে পারবেন
- আউটসোর্সিং কৌশল কী তা বর্ণনা করতে পারবেন

ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। এ পাঠে আমরা আরও তিনটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো আত্মরক্ষামূলককৌশল, আক্রমণাত্মক কৌশল,গাঁটখোলা কৌশল ও আউটসোর্সিং কৌশল। প্রথমে আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিয়ে এ পাঠের আলোচনা শুরু করা হবে।

আত্মরক্ষামূলক কৌশল
Defensive strategy

আত্মরক্ষামূলক কৌশল বলতে কী বোঝায়?

আত্মরক্ষামূলক কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। আত্মরক্ষামূলক কৌশল কোম্পানির বর্তমান ভাল প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবস্থান ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় বা খারাপ বাজার অবস্থা ভালো করার জন্য ব্যবহার করা হয়। **বায়ার, রু ও জাহরা** (১৯৯৬) বলেন, "আত্মরক্ষামূলক কৌশল হলো একটি ঋণাত্মক ধারাকে উল্টিয়ে দেওয়া বা একটি সংকট বা সমস্যা অবস্থাকে অতিক্রম করার একটি কৌশল" [Defensive strategy is a strategy to reverse a negative trend or to overxome a crisis or problem situation.]। এটি ক্ষতি বা ঝুঁকি কমানোর একটি ব্যবস্থাপকীয় পদক্ষেপ। এ কৌশল কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দৃঢ় করে, প্রতিযোগীদের আক্রমণ থেকে বাজারকে রক্ষা করে, আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায় ও কোম্পানির সম্পদ ও সামর্থ্যকে সংরক্ষণ করে। তবে, আত্মরক্ষামূলক কৌশল একটি স্বল্পকালীন সমাধান কৌশল।

এবার আলোচনা করা হবে কোন অবস্থার কারণে এআত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করা হয়।

কখন আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিতে হবে

আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করার অবস্থাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **দেশে অর্থনেতিক মন্দা দেখা দিলে:** দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দা দেখা দিলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার সংকটে পড়ে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ ছাড়া বিকল্প থাকে না।

২. **কোম্পানির আর্থিক সমস্যা প্রকট হলে:** কোম্পানির অর্থ সংকট দেখা দিলে ব্যবসায়ের উৎপাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় অর্থের সংস্থান করার জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প থাকে না।

৩. **উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অদক্ষতা দেখা দিলে:** উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অদক্ষতার কারণে পণ্য উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে। ফলে, বাজারে টিকে থাকা যায় না। এ অবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতার দক্ষতা ফিরে পাওয়ার জন্য যন্ত্রপাতির অধুনিকায়ন ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বা নতুন দক্ষ কর্মচারী সংগ্রহের জন্য অর্থের সংস্থান করার জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করা হয়।

৪. **কোনো একজন প্রতিযোগী সাড়া জাগানো উদ্ভাবন করলে:** কোনো একজন প্রতিযোগী সাড়া জাগানো উদ্ভাবন করে পণ্য উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ফেললে বাজার তার দখলে চলে যায়। তখন ব্যাপক লোকসান এড়ানোর জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৫. **তীব্র সংকটপূর্ণ সময় আসছে এমন পূর্বাভাষ পাওয়া গেলে:** শিল্পের সার্বিক ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে তীব্র সংকটপূর্ণ সময় আসছে এমন পূর্বাভাষ পাওয়া গেলে কোম্পানি সংকটে পড়ার আগেই বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না।

৬. **মালিক যদি ব্যবসায়ে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে:** এটি একটি বিশেষ অবস্থা। মালিক একই ব্যবসায়ে দীর্ঘ দিন থাকার ফলে একঘেয়েমির স্বীকার হতে পারে বা এ ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন তিনি এ ব্যবসায় থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করে।

এবার অমরা বিভিন্ন রকম আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

আত্মরক্ষামূলক কৌশল কী কী?

আমরা জানি আত্মরক্ষামূলক কৌশল হলো খারাপ ধারাকে উল্টিয়ে দিয়ে ভালো ধারার পরিণত করার একটি কৌশল বা সংকট বা সমস্যা অবস্থাকে অতিক্রম করার একটি কৌশল। এ জন্য যে সকল কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১। ঘুরে দাঁড়ানো কৌশল (Turnaround strategy): কোম্পানির বর্তমান ঋণাত্মক কার্যধারা উল্টো ধারায় রূপান্তর করার মাধ্যমে কোম্পানিকে লাভজনকতার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কৌশল হলো ঘুরে দাঁড়ানো কৌশল। কোম্পানির মুখ্য কার্য প্রণালিতে পরিবর্তন এনে কোম্পানিকে লোকসান ও অদক্ষতা থেকে লাভজনক দক্ষ কোম্পানিতে পরিণত করা হয়। একটি কোম্পানি খারাপ ব্যবস্থাপনা, কার্য আওতার অতিসম্প্রসারণ, অপর্যাপ্ত আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ কার্যসম্পাদন ব্যয়, নতুন প্রতিযোগীর আবির্ভাব, অপ্রত্যাশিত চাহিদা বদল ও সাংগঠনিক জড়তার কারণে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে পতনের মুখে পড়ে ও কোম্পানি লোকসান করতে থাকে। ঘুরে দাঁড়ানো কৌশল এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কোম্পানিকে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনে। ঘুরে দাঁড়ানো কৌশলের পাঁচটি উপায় আছে। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

[ক] **পুনরুজ্জীবিতকরণ কৌশল:** যার মাধ্যমে কোম্পানি নতুন প্রতিযোগিতামূলক কৌশল ব্যবহার, মুখ্য কার্য এলাকার আমূল পরিশোধন, একত্রীকরণ/মার্জার, গুরুত্বহীন পণ্য ও সেবা ছাঁটাই করা ইত্যাদির মাধ্যমে কোম্পানিকে মৌলিক ভাবে পুনঃনির্মাণ ও পুনঃঅবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

[খ] আয় বৃদ্ধি কৌশল: যার মাধ্যমে শ্রম সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ, ব্যবসায় প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রকৌশল, বাজারজাতকরণ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি, উপযুক্ত মূল্য কৌশল, সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যবহার করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

[গ] সম্পদ হ্রাস কৌশল: যার মাধ্যমে কিছু সম্পদ বিক্রি, লোকবল ছাঁটাই ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে নগদ টাকার অভাব পূরণ করার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

[ঘ] **ব্যয় হ্রাস কৌশল:** যার মাধ্যমে কড়া আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, প্রান্তিক পণ্য বা সেবা কর্তন, লোকবল ছাঁটাই, গুরুত্বহীন কাজ ছাঁটাই ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

[ঙ] **নেতৃত্ব বদল কৌশল** যার মাধ্যমে প্রধান নির্বাহী ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা পরিবর্তন করে কোম্পানিতে নতুন কার্য সংস্কৃতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কোম্পানি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে।

২। আংশিক বিক্রি কৌশল (Divestment strategy): যার মাধ্যমে পতনশীল কোম্পানির কোনো অংশ যেমন একটি পণ্য বা সম্পদের কোনো অংশ অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বা কোম্পানির বর্তমান ব্যবস্থাপকদের কাছে বা অন্য কোন ব্যক্তিদের কাছে সন্তোষজনক দামে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে আত্মরক্ষা করা হয়।

৩। কোম্পানির অবসায়ন (Liquidation strategy): যার মাধ্যমে আইনে প্রদত্ত পন্থায় পতনশীল কোম্পানিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, সব সম্পদ বিক্রি করে দেয়া হয় ও অবসায়নের পর প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে আত্মরক্ষা করা হয়।

৪। দেউলিয়া ঘোষণা (Insolvency strategy): যার মাধ্যমে আইনে প্রদত্ত পন্থায় পতনশীল কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার মাধ্যমে পাওনাদারদের হাত থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া যায় ও বাস্তবায়নে বাধ্য চুক্তির প্রতিপালন থেকে কিছু কালের জন্য ছাড় পাওয়া যায়। এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মাধমে আত্মরক্ষা করা।

৫। বন্দি কৌশল (Captive strategy): যার মাধ্যমে পতনশীল কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ অন্য কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে কোম্পানির কতিপয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং তার বদলে তাদেরকে বন্দি কোম্পানির পণ্যের একটা বড় অংশ কিনতে হয়। আর প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে কোম্পানি আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে।

৬। পুনর্গঠন কৌশল (Restructuring strategy): কোম্পানি নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে ব্যয় কমানো ও দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করে কোম্পানি বাঁচানোর চেষ্টা করে। এজন্য লম্বিক একত্রীকরণ, সমান্তরাল একত্রীকরণ, ছাঁটাই, কিছু সম্পদ বিক্রি, ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন, পরিচালনা পরিষদ পরিবর্তন, ব্যয়সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যয় কমায় ও দক্ষতা বাড়িয়ে সার্বিক পারদর্শিতা বৃদ্ধি করে।

এবার আমরা যে সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো আক্রমণাত্মক কৌশল।

আক্রমণাত্মক কৌশল
Offensive strategy

আক্রমণাত্মক কৌশল বলতে কী বোঝায়?

আক্রমণাত্মক কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল।আক্রমণাত্মক কৌশল হলো বাজার নেতার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করার কৌশল। আক্রমণাত্মক কৌশল অবশ্যই সৃষ্টিশীল হতে হয় যাতে প্রতিযোগীরা বিপরীত কৌশল নিয়ে বাঁধা দিতে না পারে। আক্রমণাত্মক কৌশলের জীবন কাল খুব দীর্ঘ হয় না। আক্রমণাত্মক কৌশলের তিনটি কাল আছে (থম্পসন ও স্ট্রিকল্যান্ড,২০০৩)। শুরুতে 'উত্থান কাল' স্বল্পমেয়াদী হয় এবং কিছুকাল স্বল্প ফল দেয়, পরবর্তীতে 'সুবিধা কাল' দীর্ঘমেয়াদি হয় ও বেশি সুফল পাওয়া যায় এবং শেষ পর্যায়ে 'ক্ষয় কাল' যখন প্রতিযোগীরা বিপরীত কৌশল নিয়ে চলে আসে ও সুফল পড়তে থাকে। আক্রমণাত্মক কৌশলের হাতিয়ার হলো মূল্যের নাটকীয় কর্তন, খুবই সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল বিজ্ঞাপন প্রচারণা, স্বতন্ত্রভাবে নকশাকৃত পণ্য যা ক্রেতাদের হঠাৎ করে বিপুল পরিমাণে আকর্ষণ করতে পারে।

এখন আমরা সফল আক্রমণাত্মক কৌশলের পূর্বশর্তনিয়ে আলোচনা করব।

সফল আক্রমণাত্মক কৌশলের পূর্বশর্ত

আক্রমণাত্মক কৌশল প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে আক্রমণ। এ আক্রমণ সফল করতে হলে নিচে অবস্থাগুলো অনুকূলে থাকা দরকার।

১. আক্রমণাত্মক কৌশল যৌক্তিক কাল পর্যন্ত ক্রেতাদের এ জয় করতে পারবে।

২. আক্রমণাত্মক কৌশল ব্যবহার করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতা থাকতে হবে।

৩. আক্রমণাত্মক কৌশল প্রতিযোগীদের পাল্টা কৌশল ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার জন্য অব্যাহত ভাবে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম চালাতে হবে।

৪. কোম্পানির বাজার অবস্থান ধরে রাখার জন্য আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ অনুবর্তন কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

এখন চলুন আক্রমণাত্মক কৌশলের ধরনগুলো জেনে নিই।

আক্রমণাত্মক কৌশলের ধরন

কটলার ও শিং (১৯৮১) আক্রমণাত্মক কৌশলের নিম্নবর্ণিত ধরনগুলো বর্ণনা করেছেন:

১। প্রতিযোগীর শক্তি অর্জন বা অতিক্রমের উদ্যোগ: আক্রমণাত্মক কৌশলগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী কৌশল হলো প্রতিযোগী পণ্যের সমরূপ পণ্য বা তার চেয়ে ভালো পণ্য কম দামে বিক্রি করা। এজন্য প্রথমে ব্যয় সুবিধা অর্জন করতে হবে, তারপর পণ্যের মূল্য কমিয়ে প্রতিযোগীকে আঘাত করতে হবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য কৌশলগুলো হলো পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির একধাপ এগিয়ে যাওয়া, নতুন পণ্য বৈশিষ্ট্য সংযোজন যা প্রতিযোগীর ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে, পণ্যের তুলনা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া, প্রতিযোগীর পশ্চাৎ ভাগে মুখ্য উৎপাদনী কারখানা স্থাপন করা, পণ্য লাইন বাড়িয়ে প্রতিযোগীর সমান করা ও উচ্চ ক্রেতা সেবা ক্ষমতা তৈরি করা। এ সকল কৌশলের মাধ্যমে নানামুখী ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করে প্রতিযোগীকে আঘাত করা যায়।

২। প্রতিযোগীর দুর্বলতা মূলধনীকরণের উদ্যোগ: প্রতিযোগীর দুর্বলতাগুলোকে পুঁজি করে তাকে অক্রমণ করা যায়। যেমন প্রতিযোগী পণ্যের মান, বৈশিষ্ট্য বা পারদর্শিতার ঘাটতি পূরণ করা, প্রতিযোগীর সেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্রেতাদের জন্য বিশেষ বিক্রয় প্রণোদনা, প্রতিযোগীর দুর্বল ব্রান্ড স্বীকৃতিকে পুঁজি করে দক্ষ বাজারজাতকরণ ও শক্তিশালী ব্রান্ড নাম দিয়ে ক্রেতা আকর্ষণ, প্রতিযোগীর দুর্বল উপস্থিতিযুক্ত ভৌগলিক এলাকায় কেন্দ্রীকরণ ও প্রতিযোগীর অবহেলিত ক্রেতা খণ্ডের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া ইত্যাদি কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিযোগীর ক্রেতাদের ভাগিয়ে আনা যায়।

৩। যুগপৎ বহুমুখী উদ্যোগ: কোম্পানি বহুমুখী ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ব্যাপক প্রতিযোগিতামূলক আক্রমণ শুরু করে প্রতিযোগীকে হটিয়ে দিতে পারে। এমন যুগপৎ বহুমুখী আক্রমণ উদ্যোগ হলো মূল্য কর্তন, বর্ধিত বিজ্ঞাপন, নতুন পণ্য বাজাজাতকরণ, ফ্রি নমুনা, কুপন, দোকানের মধ্যে প্রসার কার্যক্রম, রিবেট, নগদ বাট্টা ইত্যাদি। এ ধরনের বহুমুখী আক্রমণ প্রতিযোগীকে নাজেহাল ও দিশেহারা করে ফেলে। এ সুযোগে বাজার দখল করা যায়।

৪। শেষ আক্রমণ হিসেবে স্বল্প প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গমন: এ কৌশলে সরাসরি প্রতিযোগীকে আক্রমণ না করে প্রতিযোগীর অবহেলিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাকে আক্রমণ করা যায়। যেমন, এমন নতুন পণ্য সূচনা করা, যা বাজার ও প্রতিযোগিতার শর্তের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করবে, প্রতিযোগীর অবহেলিত ভৌগলিক এলাকায় শক্তিশালী বাজার অবস্থান তৈরি করা, স্বতন্ত্র পণ্য বৈশিষ্ট্য ও পারদর্শিতাযুক্ত পণ্য নিয়ে নতুন বাজার খন্ড তৈরি করা, পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির একধাপ এগিয়ে যাওয়া পণ্য বাজারে নিয়ে আসা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে প্রতিযোগীকে আঘাত করা যায়।

৫। গেরিলা আক্রমণ: এ কৌশলটি যাদের বিশাল সম্পদ নেই ও সার্বিক আক্রমণ করার মতো দৃশ্যমান বাজার নেই এমন ছোটো চ্যালেঞ্জার ব্যবহার করতে পারে (মিংজাচেন ও হ্যামব্রিক, ১৯৯৫)। বাজার নেতার উপর গেরিলা আক্রমণ বিচ্ছিন্ন ও এলোমেলো ভাবে করা হয়। মাঝেমাঝে পণ্য দামে স্বল্প ছাড়, বিস্ময়কর বাজার প্রসার কার্যক্রম যেমন এক সপ্তাহের জন্য ২০% মূল্য ছাড়, বাজার নেতার প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বা কোন সমস্যা হলে তখন বিশেষ ক্যাম্পেইন করে ক্রেতা আকর্ষণ, প্রতিযোগীর সেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্রেতাদের নিশ্চিত পণ্য ডেলিভারি সেবা বা দ্রুত কারিগরি সেবা প্রদান ইত্যাদি ধরনের গেরিলা আক্রমনের কৌশলগুলো ব্যবহার করে বাজার দখল করা যায় (ম্যাকমিলান, ১৯৮০)।

৬। অতর্কিত আক্রমণ: প্রতিযোগীদের কাছে অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তিত সময়ে ও উপায়ে তাদের উপর আক্রমণ করাকে অতর্কিত আক্রমণ কৌশল বলে। এ জন্য আক্রমণকারী কোম্পানির সৃষ্টিশীল ও উদ্ভবনী সম্পদ ও সক্ষমতা থাকতে হবে।

ম্যাকমিলান (১৯৮৩) অতর্কিত আক্রমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য কতিপয় উপায় সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হলো: [ক] মূল্যবান প্রযুক্তির উপর বিশেষজ্ঞ দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রণ আছে এমন কোম্পানি কিনে নিয়ে তা শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা; [খ] বিশেষ ভৌগলিক এলাকার সর্বোত্তম বণ্টন প্রণালীর দখল নেয়া; [গ] সবচেয়ে ভাল সরবরাহকারীর সঙ্গে চুক্তি করা; [ঘ] সর্বাপেক্ষা ভাল লোকেশনে চলে যাওয়া; [ঙ] উৎপাদন ক্ষমতার অগ্রিম বৃদ্ধি; [চ] বড় প্রতিষ্ঠানের অর্ডার ধরা; [ছ] স্বতন্ত্র্য ও নকল করা যায় না এমন ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বাজার নেতা, রানার্স আপ কোম্পানি, বাজার থেকে বের হওয়ার মুখে পতিত কোম্পানি এবং ছোটো স্থানীয় ও আঞ্চলিক কোম্পানিকে আক্রমণ করা যায় ও তাদের বাজার দখল করা যায়।

এবার আমরা যে সর্বজন-অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো গাঁটখোলা কৌশল।

গাঁটখোলা কৌশল

Unbundling strategy

গাঁটখোলা কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। গাঁটখোলা কৌশল হলো কোনো একটি সম্পর্ক বা গাঁট বা বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল। একত্রীকরণ কৌশল অর্থাৎ অগ্রমুখী একত্রীকরণ বা পশ্চাৎমুখী একত্রিকরণ এর যে কোনো একটি বা উভয়টি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কৌশল হলো গাঁটখোলা কৌশল। একত্রীকরণ কৌশল অনেক সময় ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যায়, ব্যবস্থাপনা করা কঠিন হয়ে যায়, লাভজনক থাকে না। তখন কোম্পানি একত্রীকরণ কৌশল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য গাঁটখোলা কৌশল ব্যবহার করে এবং অগ্রমুখী বা পশ্চাৎমুখী একত্রিকরণ বাদ দিয়ে অন্তর্মুখী সরবরাহ বা বহির্মুখী বণ্টন ব্যবস্থা স্বাধীন বণ্টন প্রণালির হাতে ছেড়ে দেয়। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি লাভবান হয়।

এবার আমরা যে সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, সে কৌশলটি হলো আউটসোর্সিং কৌশল।

আউটসোর্সিং কৌশল

Outsourcing strategy

আউটসোর্সিং কৌশল একটি ননজেনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। আউটসোর্সিং কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় কৌশল। এ কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানি তার খুচরা যন্ত্রাংশ, মানব সম্পদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়ার জন্য নিজে সরাসরি সংগ্রহ না করে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধমে সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মান কোম্পানি নির্দিষ্ট করে দেয়। আউটসোর্সিং কোম্পানি সে অনুসারে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে। বাংলাদেশে নিরাপত্তা প্রহরী, গৃহকর্মী, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, হিসাবরক্ষণ কাজ, বিজ্ঞাপন, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত ইত্যাদি হাজার রকমের কাজ আউটসোর্সিং কৌশল ব্যবহার করে করা হচ্ছে। কোম্পানির চেয়ে কম দামে, উপযুক্ত মানে ও নির্ভরযোগ্য সময়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা পাওয়া যায়, তা হলে আউটসোর্সিং কৌশল ব্যবহার করে কোম্পানি লাভবান হয় ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

আত্মরক্ষামূলক কৌশল একটি ননজিনেরিক বা সর্বজন অজ্ঞাত কৌশল। আত্মরক্ষামূলক কৌশল কোম্পানির বর্তমান ভাল প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবস্থান ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় বা খারাপ বাজার অবস্থা ভালো করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কৌশল কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দৃঢ় করে, প্রতিযোগীদের আক্রমণ থেকে বাজারকে রক্ষা করে, আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায় ও কোম্পানির সম্পদ ও সামর্থ্যকে সংরক্ষণ করে। তবে, আত্মরক্ষামূলক কৌশল একটি স্বল্পকালীন সমাধান কৌশল। আক্রমণাত্মক কৌশল হলো বাজার নেতার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করার কৌশল। আক্রমণাত্মক কৌশল অবশ্যই সৃষ্টিশীল হতে হয় যাতে প্রতিযোগীরা বিপরীত কৌশল নিয়ে বাঁধা দিতে না পারে। আক্রমণাত্মক কৌশলের জীবন কাল খুব দীর্ঘ হয় না। গাঁটখোলা কৌশল হলো কোনো একটি সম্পর্ক বা গাঁট বা বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল। একত্রীকরণ কৌশল অর্থাৎ অগ্রমুখী একত্রীকরণ বা পশ্চাৎমুখী একত্রীকরণ এর যে কোন একটি বা উভয়টি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কৌশল হলো গাঁটখোলা কৌশল। আউটসোর্সিং কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় কৌশল। এ কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানি তার খুচরা যন্ত্রাংশ, মানব সম্পদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়ার জন্য নিজে সরাসরি সংগ্রহ না করে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধমে সংগ্রহ করে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. সর্বজন অজ্ঞাত কৌশলকী বোঝায়?
২. সমবায় কৌশল কী বোঝায়?
৩. সমবায় কৌশল কেন গ্রহণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. কৌশলগত জোট কৌশলকী?
৫. কৌশলগত জোট কৌশল কেনতা ব্যাখ্যা করুন।
৬. যৌথ কারবার কৌশল কী তা বুঝিয়ে বলুন।
৭. যৌথ কারবার কৌশল গ্রহণ করা হয় কেনতা ব্যাখ্যা করুন।
৮. যৌথ কারবার ব্যর্থ হয় কেনতা ব্যাখ্যা করুন।
৯. একীভূতকরণকৌশলকী?
১০. অধিগ্রহণ কৌশল বলতে কী বোঝায়?
১১. অধিগ্রহণ কৌশল ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
১২. কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে তাব্যাখ্যা করুন।
১৩. কখন অধিগ্রহণ কৌশল ভালো কাজ করে নাতাব্যাখ্যা করুন।
১৪. স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল কী?
১৫. স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি কৌশল কেনগ্রহণ করা হয়তা ব্যাখ্যা করুন।
১৬. প্রবৃদ্ধি কৌশল কী তা বুঝিয়ে বলুন।
১৭. প্রবৃদ্ধি কৌশল কৌশল গ্রহণ করা হয় কেনতা ব্যাখ্যা করুন।
১৮. কেন্দ্রীভূতকরণকৌশলকী?
১৯. কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলে গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
২০. কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
২১. লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল কী তা বুঝিয়ে বলুন।
২২. কোন কোন অবস্থায় লম্বিক একত্রীকরণ কৌশল গ্রহণ করা হয় তাব্যাখ্যা করুন।
২৩. লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের সুবিধাবলি বর্ণনা করুন।
২৪. লম্বিক একত্রীকরণ কৌশলের অসুবিধাবলিবর্ণনা করুন।
২৫. ফসল তোলা কৌশল বলতে কী বোঝায় তা লিখুন।
২৬. কি অবস্থা হলে ফসল তোলা কৌশল ব্যবহৃত হবে তা বর্ণনা করুন।
২৭. ফসল তোলা কৌশলে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয় বর্ণনা করুন।
২৮. ফসল তোলা কৌশলের খারাপ প্রতিক্রিয়া কী কী তা বর্ণনা করুন।
২৯. আত্মরক্ষামূলককৌশলকী তা বুঝিয়ে বলুন।
৩০. কখন আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিতে হবেতা বর্ণনা করুন।
৩১. আত্মরক্ষামূলক কৌশল কী কী তা বর্ণনা করুন।
৩২. কেন্দ্রীভূতকরণ কৌশলের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৩৩. আক্রমণাত্মক কৌশল কী?
৩৪. সফল আক্রমণাত্মক কৌশলের পূর্বশর্ত বর্ণনা করুন।
৩৫. আক্রমণাত্মক কৌশলের ধরনগুলো বর্ণনা করুন।
৩৬. গাঁটখোলা কৌশল কী বুঝিয়ে বলুন।
৩৭. আউটসোর্সিং কৌশল কী ব্যাখ্যা করুন।